উৎপল দত্ত-র ‘ফেরারী ফৌজ’
ঔপনিবেশিকতা-বিরোধী সশস্ত্র সংগ্রামের খণ্ড অধ্যায়

অর্ণব সাহা

উৎপল দত্ত: দ্য এজিটেটর, দ্য প্রোপাগাণ্ডিস্ট

মৃত্যুর আগের দিন সন্ধেবেলায় ঘণ্টা দুয়েকের একান্ত আলাপচারিতায়ও উৎপল দত্ত বলেছিলেন — ‘‘আত্মজীবনী! এখন কী! পরে লেখা যাবে!’’। ভাববাচ্যে এই উচ্চারণই বুঝিয়ে দেয়, ব্যক্তি-আমিটাকে নিয়ে তিনি আদৌ সেরকম ভাবিত ছিলেন না, বরং আরও গুরুত্বপূর্ণ কোনও কর্মসূচি পালনের জন্য তখন নিজেকে ভিতরে ভিতরে প্রস্তুত রাখছেন তিনি। সেই কর্মসূচি আর কিছুই নয়, নিজের চৌষট্টি বছরের জীবনে থিয়েটারের মাধ্যমে মার্কসবাদী রাজনীতির নিরলস প্রচারের দুর্মর অভিপ্রায় মাত্র। সামান্যই কয়েকটি রচনায় উৎপল তাঁর আত্মজীবনীর সংক্ষিপ্ত ভূমিকা যেন লিখে রেখে গেছেন। প্রথমটি, মে, ১৯৭৭ সালে ‘এপিক থিয়েটার’-এ প্রকাশিত *লিটল থিয়েটার ও আমি* নামক স্মৃতিচারণমূলক প্রবন্ধ। আর তার পরেই প্রকাশিত তাঁর একটি পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধের বই — *টুওয়ার্ডস আ রেভোলিউশনারি থিয়েটার*। এর পাশাপাশি বিভিন্ন সময়ে একাধিক পত্রপত্রিকায় দেওয়া তাঁর সাক্ষাৎকারগুলোর মধ্যেও তাঁর ব্যক্তিগত জীবন ও অবিশ্রান্ত কর্মধারার একটা সচল ছবি ধরা পড়েছে। সেখানেও অবশ্য একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়ের তুলনায় থিয়েটারের প্রয়োগবৈশিষ্ট্য ও মতাদর্শ প্রচারের বিষয়, সমকালীন সমাজ ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বৈপ্লবিক থিয়েটার নির্মাণের দায়বদ্ধতাকে ধরার চেষ্টা করেছেন উৎপল। বাংলা থিয়েটার কীভাবে রাজনৈতিক থিয়েটার হয়ে উঠতে চেয়েছে, তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন; ‘‘শুধুমাত্র রাজনৈতিক নাট্য ঐতিহ্যের জন্যই বাংলা রঙ্গমঞ্চ রাজনৈতিক হয়ে ওঠেনি। দেশের বৃহত্তর রাজনৈতিক সংগ্রামের অঙ্গ হিসাবেই বাংলা থিয়েটারে রাজনীতি প্রবেশ করতে বাধ্য। আজ যেমন বিশ্ব জুড়ে ধনতান্ত্রিক শাসন শোষণের বিরুদ্ধে শোষিত সর্বহারার সংগ্রাম তীব্রতর হয়ে উঠেছে, তেমনি শ্রেণীবিভক্ত শিল্প সাহিত্য নাটকের মঞ্চেও অবিরাম রণযাত্রা। বাংলা রঙ্গমঞ্চও সে সংগ্রামে পিছিয়ে নেই...এখানে বামপন্থী রাজনৈতিক মতবাদী নাট্যশিল্পীরা শোষিত শ্রেণির পক্ষে, আর বিরোধীরা শোষক ধনিক শ্রেণির পক্ষে নাট্য প্রযোজনায় রত। অর্থাৎ পশ্চিমবাংলার সমস্ত মঞ্চেই রাজনীতি প্রচারিত। কেউ মুখে স্বীকার করেন, কেউ করেন না। কিন্তু নাটক বিচারে একটু সতর্ক দৃষ্টিপাতেই তাদের শ্রেণিচরিত্র প্রকাশ পায়, তাদের শ্রেণি রাজনীতি প্রকট হয়ে ওঠে।’’ সেইসময়ে রাজনৈতিক বিরোধিতার স্বরূপ কীভাবে নাট্যজগতে প্রকট হয়ে

উঠেছিল, তার স্বরূপও তিনি স্বল্প কথায় ফুটিয়ে তুলেছেন — ''কেউ নাটকে বিশুদ্ধ শিল্প খুঁজতে পারেন, কেউ দু'চারটে ভালো ভালো কথা শোনাতে পারেন, কেউ নাটক বলতে শুধু নর্তকীর দেহ আর অঙ্গভঙ্গি বুঝে সে মত প্রচার করতে পারেন, কিন্তু এই সবই তাদের রাজনীতির অঙ্গ, শ্রেণি রাজনীতি। এ-সবই সচেতন শ্রেণি পক্ষপাত। রাজনৈতিক প্রচার কৌশল''। এমনকী, গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলনের সঙ্গেও তর্কে জড়িয়েছেন এই মানুষটি। লিখেছেন — ''শুধুমাত্র প্রগতিশীল হওয়াটাই আজ আর যথেষ্ট নয়...অত্যাচার অনাচারের সামান্য সমালোচনামূলক আলেখ্য প্রদর্শন করে বুর্জোয়া ক্রিটিক্যাল রিয়ালিজমের ঊর্ধ্বেও ওঠা যাবে না...এই মুহূর্তে প্রয়োজন রেভোলিউশনারি রিয়ালিজম-এর, বৈপ্লবিক বাস্তবতা প্রদর্শনের''। তিনি বিশ্বাস করতেন, ''নাটক আমাদের কাছে একান্তভাবে একটি সামাজিক ক্রিয়া। সমাজ পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে যদি তাকে ধরতে হয় তবে প্রতিমুহূর্তে পরিবর্তন লক্ষ করার চোখ তৈরি করতে হয়। উপরন্তু অভিনেতা নিজেই এক জীবন্ত মানুষ, ক্রমান্বয়ে পরিবর্তনশীল...তাই অভিনেতা যদি নিজেকে জানতে চান, তবে ডায়লেকটিক্যাল মন তৈরি না করে উপায় কী''।

টুওয়ার্ডস আ রেভোলিউশনারি থিয়েটার বইয়ের তিনটি অধ্যায় — ডায়লেকটিকস অফ দ্য থিয়েটার, পলিটিক্যাল থিয়েটার এবং ইন সার্চ অফ ফর্ম। এই বইয়ের দ্বিতীয় অধ্যায়েই উৎপল তাঁর সেই প্রবাদপ্রতিম উক্তি করেছেন — "I am partisan not neutral– and I believe in political struggle. The day I cease to participate in political struggle– I shall be dead as an artist too". সচরাচর কোনও বাঙালি নাট্যশিল্পীই এরকম কথা বলেন না। উৎপল এক্ষেত্রে স্বভাবতই ব্যতিক্রম। এই ব্যতিক্রমী ক্ষমতা নিয়েই শিক্ষিত অভিজাত পুলিশ কর্মচারীর পুত্র কলেজজীবনেই অভিনেতা হবার প্রতিজ্ঞা করেন। কলেজে পড়াকালীন পরীক্ষা শিকেয় তুলে পেশাদার অভিনেতা হিসেবে ভারতভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন। স্কুলজীবন থেকেই নিষিদ্ধ রাজনৈতিক সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হন। অভিজাত সমাজের গণ্ডির ভিতরেই প্রাথমিকভাবে ইউরোপীয় থিয়েটারকে আত্মীকৃত করেন, আবার তিনিই সেই আভিজাত্যের গণ্ডি কাটিয়ে লিটল থিয়েটার গ্রুপ নিয়ে শ্রমিক-কৃষক-মজদুরের প্রাত্যহিক সংগ্রামের সাথী হয়ে উঠবেন। এই সবকিছুই কিন্তু সম্ভব হয়েছিল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ফলে উদ্ভূত শ্রমিক-কৃষকের রাজনৈতিক দর্শনের নিজস্ব অভিঘাতের প্রতিক্রিয়ায়। বিপ্লবী বস্তুবাদী দর্শন-সূত্রের মধ্যেই একজন অভিনেতার শিল্পসৃষ্টির ক্ষমতা বিকশিত হতে পারে — এরকম একটি সত্যকেই দীর্ঘ অনুশীলনের মধ্য দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন উৎপল। এই বইয়ের প্রথম অধ্যায় — 'বিপ্লবী থিয়েটারের অভিমুখে'-তে এই ভাবনারই বিস্তার ঘটেছে। এই অধ্যায়েই তিনি লিখেছেন — ''অভিনয় শিল্প নিজেই এক দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া। একজন অভিনেতা কতোখানি সে নিজে আর কতোখানি সে মঞ্চস্থ বানানো সত্যের আভাসে নাট্য-বর্ণিত চরিত্র। এর সমাধানও অভিনেতাকে করতে হয় দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায়। অভিনেতার এই দ্বৈত সত্তার মধ্যে নিয়ত আদান-প্রদানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয় নাট্যোক্ত বিশ্বাসযোগ্যতা, দর্শক যার অংশীদার''। বাস্তব দর্শকের অভিজ্ঞতার পরিমণ্ডল স্বীকার করে নিয়েই 'মানুষের অধিকারে' নাটকের স্যাম লিবোভিটস্‌কে সাদা মানুষের বর্ণ বিদ্বেষবাদের বিরুদ্ধে লড়াকু নেতা করতে গিয়ে প্রথমে তাকে প্রায় মেসায়া ভেবে নেন উৎপল, পরে তাকে দর্শকের অভিজ্ঞতার স্তরে নেমে শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ প্রবাদ অনুযায়ী নেতিবাচক চরিত্ররূপে যখন প্রতিষ্ঠিত করেন, তখন কালা মানুষের পক্ষে সাদা চামড়ার লিবোভিটস হয়ে ওঠেন 'was more human, more wholesome, more complete'। উৎপল দেখান, এই পুঁজিবাদী এলিয়েনেটেড সমাজে আদর্শ নায়কচরিত্রের মধ্যেও দোষে-গুণে মিলিত বাস্তবতা থাকতে হবে। মানুষ একজন কমিউনিস্ট চরিত্রের আদর্শে অনুপ্রাণিত হবে তখনই যখন সেই চরিত্রটি দোষে-গুণে মিলিত মানুষ

হিসেবে বাস্তবের মাপে মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। সেই চরিত্র সৃষ্টিতে আমাদের রাজনৈতিক নাট্যকর্মের ব্যর্থতা দূর করার জন্যই দেশের দর্শকসমাজের অভিজ্ঞতার পরিমণ্ডলকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে দেখা দরকার। এক্ষেত্রে মাও-সে-তুঙের popularization along with elevation তত্ত্বকে গুরুত্ব সহকারে দেখার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন উৎপল। কেবল জনপ্রিয়তা অর্জনের দ্বারা ব্যাপক সংখ্যক দর্শকের কাছে নিয়মিত অভিনয় করেই থিয়েটারের সকল বৈপরীত্যের সমাধান-কল্পে সামাজিক প্রতিনিধিত্ব সম্ভব। বাংলা থিয়েটারের ভিতর অন্তর্লীন এক বিশেষ মধ্যবিত্ততার জন্যই তাতে পেটিবুর্জোয়া শ্রেণি-সমঝোতার মানসিকতা প্রায় আগাগোড়া কাজ করে যায়। উৎপল এই প্রবন্ধে সেই পেটিবুর্জোয়া মানসিকতার বদলে পরিবর্তমান বিশ্বে থিয়েটার-শিল্পকে সামাজিক দায়, সামাজিক কাজ হিসেবে আত্মস্থ করার জন্যই সর্বহারার দৃষ্টিভঙ্গিকে গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। এই বইয়ের দ্বিতীয় অধ্যায় হল 'দ্য পোলিটিক্যাল থিয়েটার', যা সমাজতান্ত্রিক বিশ্ববিপ্লবের লক্ষ্যে এবং ভারতের মতো আধা সামন্ততান্ত্রিক আধা ধনতান্ত্রিক কাঠামোর দেশে পেটিবুর্জোয়া মোহ কাটিয়ে শ্রমিক-কৃষক-সাধারণ মানুষের শ্রেণিসংগ্রাম বিকশিত করার উদ্দেশ্যে একান্ত জরুরি। এই দৃষ্টিকোণ ছাড়া আমাদের দেশের প্রগতিশীল সংস্কৃতিকে এগিয়ে নেওয়া যাবে না বলেই তিনি বিশ্বাস করতেন। তাঁর মতে, আমাদের প্রগতিশীল চিন্তাবিদরাও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খণ্ডিতকে সমগ্রের বিকল্প বিবেচনা করেন। বিশেষকে নির্বিশেষ থেকে বিচ্যুত করে দেখার অভ্যাস একধরনের বুর্জোয়া অভ্যাস যা শেষ অব্দি বিচ্যুতির শিকার হয়। এমনকী ১৯৫০-৫১ সালে যখন মাত্রই দশমাসের জন্য ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের সঙ্গে যুক্ত হন, তখনও সংগঠনের আমলাতান্ত্রিক নেতৃত্বের মধ্যে দেখেছিলেন 'quota of ignorant windbags', যাদের সঙ্গে পার্টির মূল নেতৃত্বের কোনও মিল ছিল না। তবে গণনাট্যে এসেই তিনি প্রয়োজন অনুভব করেন এজিটপ্রপ নাট্যপ্রয়োগের গুরুত্ব। গণনাট্য সঙ্ঘ তাঁকে পারিবারিক ও সাংস্কৃতিক আভিজাত্যের খোলসমুক্ত করে টেনে নিয়ে যায় শ্রমিক মজুর অধ্যুষিত মেটিয়াবুরুজ গার্ডেনরিচ এলাকায়। এখানেই তিনি লাভ করেন আবুল বাশারের মতো শ্রমজীবী নেতার ঘনিষ্ঠ সংসর্গ। এখানেই তাঁর হাতেকলমে রাজনীতি শেখার প্রথম পাঠ। এরপর লিটল থিয়েটার গ্রুপ গড়ে তোলার মাধ্যমে উৎপল সরাসরি বৈপ্লবিক থিয়েটারের পথে পা বাড়ান। আরও পরে যখন পিএলটির নেতৃত্বে তাঁর থিয়েটার-আন্দোলন এগিয়ে চলেছে, তখনও বিবিধ প্রকরণের ব্যবহারের মধ্য দিয়ে উৎপল তাঁর নাটকে রেভোলিউশনারি প্র্যাক্টিস চালিয়ে যেতে চেয়েছেন। এই লেখাতেই লেনিনের *কী করতে হবে* বইয়ের সূত্র অবলম্বনে উৎপল 'এজিটেশন' এবং 'প্রোপাগাণ্ডা'র পার্থক্য বোঝাতে গিয়ে বলেছেন — "the difference is only with regard to subject matter; agitational plays concentrate on an immediate live issue, propaganda plays handle larger subjects involving the whole society– or the sufferings of an entire class."

উৎপল দত্ত যেসময়ে বড় হয়ে উঠেছেন, সেই চল্লিশ-পঞ্চাশের দশক বিশ্বজোড়া কমিউনিস্ট আন্দোলনের উত্থানের সময়। খুব স্বাভাবিকভাবেই সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে পড়ার সময় থেকেই উৎপল লেনিন-স্তালিনের সহজভাষায় লেখা রাজনৈতিক সাহিত্য পাঠে মনোযোগী হয়েছিলেন। এরপর সেইসময়ের কলকাতার অন্যতম ইংরেজি থিয়েটারের দল *দ্য অ্যামেচার শেকসপিয়ারিয়ানস*-এ অভিনয় শুরু করেন। পরে জেফ্রি কেণ্ডালের নেতৃত্বে *দ্য শেকসপিয়ারানা ইন্টারন্যাশনাল কোম্পানি*-তে পেশাদার অভিনেতা হিসেবে যোগ দেন তিনি। জুলাই মাসের ১৬-১৭ তারিখে কলেজের মঞ্চে জুলিয়াস সিজার নাটকের আধুনিক প্রয়োগ ঘটালেন তিনি। ফ্যাসিস্ত জুন্টার সবুজ উর্দি ও আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত একনায়কের ভূমিকায় জুলিয়াস সিজারের অবতরণ ঘটলে, কলকাতার বিদগ্ধমহলে সাড়া পড়ে গেল। পরের প্রযোজনা ৯ নভেম্বর, ১৯৫০, নিউ এম্পায়ার মঞ্চে ক্লিফোর্ড অডেট্স-এর *টিল দ্য ডে আই ডাই*,

নিষিদ্ধ জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির আত্মত্যাগ ও সংগ্রামের কাহিনি, কিন্তু ১৯৫০-এ তা ভারতীয় কমিউনিস্টদের বীরত্বগাথা হয়ে উঠল। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির উপর নিষেধাজ্ঞা উঠে গেলে স্মার্টা গ্রাউণ্ডের বিজয়োৎসবে এলটিজি-র এই অভিনয় দেখে ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের পক্ষ থেকে সলিল চৌধুরী এবং নিরঞ্জন সেন উৎপলের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং এলটিজি থেকে সাময়িক অবসর নিয়ে উৎপল গণনাট্য সঙ্ঘের মধ্য কলকাতা শাখায় যোগদান করেন। উৎপলের নিজের ভাষায় — ''গণনাট্য সঙ্ঘ আমাকে জনতার মুখরিত সখ্যে নিয়ে গেল। একটা ঘুম ভেঙে গেল''। সেইসময় একইসঙ্গে চলচ্চিত্র এবং থিয়েটারে একটানা অভিনয় করে চলেছেন তিনি। মাত্র দশ মাসের মধ্যেই গণনাট্য সঙ্ঘ ছাড়তে বাধ্য হলেন অপদার্থ পার্টি-আমলাদের কাঁকড়াবৃত্তির কারণে। ১৯৫৯ সালে বড়াধেমো কয়লাখনিতে দুর্ঘটনার প্রেক্ষিতে *অঙ্গার* রচনা, ওই বছর ৩১ ডিসেম্বর বাংলা মঞ্চে এর সাড়াজাগানো অভিনয়। ইতিমধ্যেই *ফেরারী ফৌজ* নাটক রচনা এবং ১৯৬১ সালের ২৮ মে এই নাটক মিনার্ভায় মঞ্চস্থ হয়। পরবর্তী সময়ে দেওয়া সাক্ষাৎকারে উৎপল এই নাটক সম্পর্কে বলেন — ''ফেরারী ফৌজ didn't fail. ফেরারী ফৌজ ran pretty well– had packed houses''. ১৯৩০-এর দশকের গোড়ায় পূর্ববঙ্গের কয়েকজন দুঃসাহসী সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামীর লড়াই নিয়ে এই নাটক লেখা হয়েছিল। কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর বিখ্যাত কবিতার নাম নাটকের নামকরণে সানন্দে ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছিলেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে বক্তৃতা দিয়েছিলেন অগ্নিযুগের প্রবাদপ্রতিম বিপ্লবী ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। প্রাক্তন বিপ্লবী গণেশ ঘোষ ও অনন্ত সিংহ উৎপলকে বলেছিলেন — ''রোম্যান্টিসাইজ করেছেন, ক্রিটিসাইজ করেননি কেন?'' এছাড়া অতীতদিনের ১০০ জন বিপ্লবী স্বাধীনতা সংগ্রামী দু'হাত তুলে উৎপলকে আশীর্বাদ করেছিলেন। উৎপলের মতে, এই নাটকে বিশ্ববিখ্যাত শিল্পী পণ্ডিত রবিশঙ্করের ধ্রুপদাঙ্গ সঙ্গীতের ব্যবহারের কুশলতা ও প্রভাব পূর্ববর্তী *অঙ্গার*-কেও ছাপিয়ে গিয়েছিল। এই নাটকের জন্যই উৎপল শ্রেষ্ঠ নাটককার রূপে ১৯৬৩ সালে সঙ্গীত নাটক আকাদেমি পুরস্কার পেয়েছিলেন।

উৎপল দত্তের বেশ কয়েকটি নাটক ও যাত্রাপালার মুখ্য বিষয়বস্তুই হল ঔপনিবেশিক বাংলার ইতিহাস। এই ইতিহাসের প্রতি উৎপলের আকর্ষণের প্রধান কারণও তাঁর মার্কসবাদী ভাবধারায় দীক্ষা। শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেওয়া *শূদ্রক* পত্রিকার বিখ্যাত সাক্ষাৎকারে এই নির্দিষ্ট মার্কসবাদী ইতিহাসবীক্ষার বিষয়টি খুলে বলেছিলেন উৎপল :

> ''ইতিহাসের পর্যালোচনা, মার্কসবাদী দৃষ্টিতে ইতিহাসকে না দেখলে পরে, মার্কসবাদী দৃষ্টিতে বর্তমানকেও দেখা যায় না। এটা আমরা বিশ্বাস করি এবং নাটকের একটা অন্যতম প্রধান কাজ হচ্ছে অতীতকে সঠিকভাবে মার্কসবাদী আলোকে তুলে ধরা। কেননা, আগের সমস্ত বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানেরই ঐতিহ্য বহন করছে আজকের কমিউনিস্টরা। কমিউনিস্টরা কোনও ভুঁইফোড় শক্তি নয়। তারা পৃথিবীতে যতো বিপ্লব আগে হয়ে গেছে, অভ্যুত্থান যতো ঘটে গেছে — সে সমস্ত ঐতিহ্যের তারা হচ্ছে উত্তরসূরী। সেটা ফরাসী বিপ্লবই হোক — গণতান্ত্রিক বিপ্লব ফ্রান্সের — বা আজকে যদি কেউ ক্রমওয়েলের বিপ্লব নিয়ে নাটক লেখে, তার থেকে শুরু করে অক্টোবর বিপ্লব পর্যন্ত, চীনের বিপ্লব পর্যন্ত — সবই আমাদের ঐতিহ্য। তারই ফল হচ্ছে ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলন। আর ভারতবর্ষের যা স্ট্রাগল হয়ে গেছে তা ডেফিনিটলি ভারতের কমিউনিস্টদের উত্তরাধিকার। সে তো তারা ক্লেইম করবেই। বিশেষ করে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী যে বিরাট দীর্ঘ সংগ্রামের ঐতিহ্য, সে ঐতিহ্যকে যদি কমিউনিস্টরা ক্লেইম করতে না পারে তাহলে চিরদিন কমিউনিস্টদের শত্রুরা তাদের দেশদ্রোহী বলে অপদস্থ এবং কোণঠাসা

করার চেষ্টা করবে। সুযোগ পেলেই তারা তাই করে থাকেন। এবং তার বিরুদ্ধে আমাদের প্রধান অস্ত্র হচ্ছে এইটেই দেখিয়ে যাওয়া যে, আজকে কেউ যদি ভারতের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের ঐতিহ্যকে ক্লেইম করতে পারে সে হচ্ছে কমিউনিস্টরা, আর কেউই নয়"।

এই বিশেষ মনোভাবের কারণেই ফেরারী ফৌজ-সহ আরও অনেক ঔপনিবেশিক-পর্বের গণ-আন্দোলন নিয়ে লেখা উৎপল দত্তের নাটকে ইতিহাসের এক বিশেষ চরিত্রায়ণ ঘটেছে। গড়ে উঠেছে ইতিহাসের এক ছকবন্দী প্রোটোটাইপ। তাঁর এইসব নাটকের প্রোটাগনিস্টরা খানিকটা একপেশে রঙে রাঙানো, তাদের চরিত্রগুলি একাভিমুখী। পূর্ববাংলার সশস্ত্র বিপ্লবীদের যে সংগ্রাম ব্রিটিশ শাসকের বুকে কাঁপন ধরিয়ে দিয়েছিল, সেই র‍্যাডিক্যাল রাজনীতিই হয়ে উঠল এই নাটকের উপজীব্য। ১৯৬১-র স্বাধীন পশ্চিমবঙ্গে এই নাটক বিপুল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। এইসময় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির উপরেও রাষ্ট্রিক নিপীড়ন অব্যাহত ছিল। টানা ২০০ রজনী অভিনীত হয়েছিল এই নাটক। সমকালীন কমিউনিস্ট পার্টির লড়াই আর ১৯৩০-এর দশকের সশস্ত্র বিপ্লবীদের সংগ্রাম কোথাও মিলে গিয়েছিল এই নাটকে। এটি ঐতিহাসিক নাটক হলেও সমকালীন বহু টুকরো কাহিনির সংযোজন ঘটেছে এখানে, কল্পনা এবং বাস্তবের সন্ত্রাসবাদী রাজনীতির সঙ্গে সেগুলির স্বাভাবিক যোগাযোগ রয়েছে।

নাটক : ফেরারী ফৌজ

শুরুতেই 'নাট্যকারের কথা' অংশে উৎপল বলছেন — ''একটা কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন। ফেরারী ফৌজ ঐতিহাসিক নাটক নয়। অথচ অন্য অর্থে ঐতিহাসিক বটে। কোনও বিশেষ ব্যক্তিবর্গ বা বিশেষ ঐতিহাসিক ঘটনাকে এ নাটকে চিত্রিত করা হয়নি। আবার তিরিশ দশকের প্রথম ভাগের পূর্ব বাংলায় জেগে-ওঠা যুবকদের বজ্রকঠিন মুখগুলোকে সাধারণভাবে সামগ্রিকভাবে এ নাটকে ধরে রাখার চেষ্টা হয়েছে। অভিনয়-কালে কেউ কেউ এর মধ্যেকার দু-একটি তথ্যকে অনৈতিহাসিক বলে সমালোচনা করেছিলেন। যাঁরা তা করেছিলেন তাঁরা সকলেই বয়ঃকনিষ্ঠ এবং বোধহয় সে যুগের ইতিহাস সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ। যাঁরা প্রত্যক্ষ সে বিদ্রোহে যোগদান করেছিলেন সেই প্রবীণ বিপ্লবীদের মত কিন্তু ভিন্ন।" এই উপক্রমণিকা থেকে শুরু হচ্ছে এই নাটক যার সূচনায় ভুবনডাঙা গ্রামের গির্জার ময়দানে যাত্রাপালা বসেছে। বিবেকের ভূমিকায় চারণকবি মুকুন্দ দাস প্রথমেই ঐতিহাসিকতার সঙ্গে এর সংযোগটিকে সূত্রবদ্ধ করেছেন — ''ভাই। আর সহা যায় না — রক্তের বন্যায় ডুবল রে দেশ, ডুবল জমিজমা, আর সহা যায় না। প্রাণ দিয়েছেন শতেক শহীদ। কারাগারে রুদ্ধ কত বীর। চট্টগ্রামে সূর্য সেন দিল মুক্তিপথের নিশানা। আর সহা যায় না।" গ্রামের জমিদার ব্রজেন চৌধুরী এবং রক্ষণশীল, অতিসতর্ক কোলাবরেটর শ্রেণির সামনে, বিনা প্রতিরোধে পুলিশ ঢোকে এবং ইন্সপেক্টর হিতেন দাশগুপ্ত ১৮৭৬ সালের নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইনবলে এই পালার অভিনয় বন্ধ করে দিলেন। পুলিশের কথা থেকেই জানা গেল, শান্তি রায় নামে সূর্য সেনের এক শিষ্যের নেতৃত্বে পাশে চণ্ডীগ্রামে বোমার কারখানা স্থাপিত হয়েছে এবং উগ্র সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের গোপন প্রস্তুতি চলেছে এলাকা জুড়ে। ব্রিটিশের সঙ্গে হাত-মিলিয়ে-চলা মধ্যশ্রেণি নিজেদের নির্লজ্জ গোলামির অভ্যাস বজায় রেখেছে। উল্টোদিকে এজিটেটর উৎপলের এই নাটকের মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে এগিয়ে আসে গ্রামের গরিব কৃষক। তাদের সংলাপ :

কৃষক (১) ।। সূর্য স্যানরে ধরবার পারে নাই। ঘর জ্বালাইছে, মায়ের কোল থেইকা দুগ্ধপোষ্য শিশুরে কাইড়া লইয়া আছাড় মারছে। তবু এক মরদের মু দিয়া একটি বাতও বারায় নাই।

কৃষক (২) ।। সূর্য স্যান কই আছেন অখন?

কৃষক (১) ।। কেমনে জানুম? সর্বত্র আছেন। আছেন ক্ষ্যাতে, লাঙলের ফলায়, শড়কির ডগায়। আছেন গঞ্জে, হাটে। আছেন আমাদের শিনায়।

কৃষক (২) ।। সূর্য স্যান মানুষ নয়, দেবতা।

কৃষক (৩) ।। না গো মোড়ল। মানুষ। তবে সে মান্‌সের চক্ষে আছে আগুন।

কৃষক (১) ।। আর বুকে আছে ভালোবাসা, এই যেমন মুকুন্দ কবিরে দেখলা।

কৃষক (২) ।। যদি তেনারে ধইরা ফেলায়? ফাঁসি দিব, না?

কৃষক (১) ।। দিউক। এক সূর্য স্যান যাউক, তার স্থানে আইব আর একজন। তারপর আর এক। চণ্ডীগ্রামে আইছে শান্তি রায়, শুনছ নি? গোরার ব্যাটারা মহকুমা চইষ্যা ফেলতে আছে শান্তি রায়রে ধরবার লাইগ্যা। পারব না।

কৃষক (২) ।। তাঁরা দেবতা। অদৃশ্য হইয়া যান...বাঁইচ্যা থাকুক গরীবের বন্ধু শান্তি রায়। যেইখানেই থাকুক, তার মরণ নাই।

কৃষক (৩) ।। খোদা তারে বাঁচাইবে। নয়া কারবালার হাসান হোসেনরে খোদাতালা বাঁচাইয়া রাখব।

এরপরেই দেখা যায় নাটকের অন্যতম প্রধান চরিত্র অশোককে। তার বাবা প্রবীণ শিক্ষক, এখন মধ্যযুগের বাংলার কুটিরশিল্প নিয়ে গবেষণা করে চলেছেন। অশোকের ঘরে আছেন প্রবল জাতীয়তাবাদী আদর্শে উদ্বুদ্ধ মা বঙ্গবাসী, শিক্ষিতা স্ত্রী শচী এবং শিশুকন্যা গোপা। ইতিমধ্যে ফাদার ফ্ল্যানাগান আসেন, যিনি জাতিতে আইরিশ, মনেপ্রাণে ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যবাদবিরোধী এবং আর্ত গরিবের সেবায় নিবেদিতপ্রাণ। এরপর একটি দৃশ্যে শিবু মণ্ডলদের বালকপুত্র পুলিশের সামনে 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি দেওয়ায় পুলিশ এসে ভয় দেখায়। তৎক্ষণাৎ অশোকের নেতৃত্বে বিপ্লবীদের একটা ছোট দল পুলিশের উপর বোমা মারে। চার্লস টেগার্টের শিষ্য অত্যাচারী পুলিশ অফিসার উইলমট সাহেবের মৃত্যু হয়। অফিসার হিতেন দাশগুপ্তর আদেশে গোটা গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। এধরনের তীব্র পরপরবিরোধী ঘাতপ্রতিঘাতের দ্বান্দ্বিক নাট্যদৃশ্য তৈরি করে দর্শকের মনে দুরন্ত আকর্ষণ তৈরির কৌশল নেন উৎপল দত্ত। এখানেই পুলিশের স্পাই নীলমণিকে দেখা যায়, নাটকের একেবারে শেষে পৌঁছে জানা যাবে এই গুপ্তচর নীলমণিই আসলে বিপ্লবী নেতা 'শান্তি রায়'।

এরপর বেশ্যা রাধারাণীর জাহাজ-ঘাটার ঘরে বিপ্লবীদের গ্রুপকে দেখা যায় — দেবব্রত ঘোষ, জ্যোতির্ময়, কুমুদ, বিপিন, অশোক এবং সিরাজুল ইসলাম সকলেই উপস্থিত। এখানে বসেই শন্তি রায়ের নির্দেশে বিপ্লবীরা এক ভয়ানক পরিকল্পনা নেয়। রাধারাণীর ঘরের তলা থেকে সুড়ঙ্গ কেটে অদূরের বটগাছতলা অব্দি নিয়ে যাওয়া হবে ডিটোনেটর তার। উইলমট সাহেবের অন্ত্যেষ্টির দিন ওইখানে এসপি, ডিএসপি, এএসপি, জজ, ম্যাজিস্ট্রেট, ডেপুটিম্যাজিস্ট্রেট, আর্মস ইন্সপেক্টর, স্টিমার কোম্পানির এজেন্ট সকলেই উপস্থিত থাকবে। সেদিনই বিস্ফোরণ ঘটিয়ে গোটা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের এজেন্টদের দলটাকে উড়িয়ে দেওয়া হবে। এই হত্যাকাণ্ড ঘটানোর প্রস্তাব পাশ হয়। এখানেই এই নাটকের কুশীলব অশোক এবং জ্যোতির্ময়দের মধ্যে দিয়ে সর্বপ্রথম মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্বের স্বাভাবিক চেহারাটা দেখান নাটককার :

অশোক ।। Hero-worship is strongest where human life is cheapest! শান্তিদাকে কতখানি ভালোবাসি তার প্রমাণ আগেও দিয়েছি। পরেও দেব। তা বলে আমার নিজের

মত ঘোষণা করতে কে আমাকে বাধা দিতে পারে দেখতে চাই।

দেবব্রত ।। বলো। মত বলো। শান্তিদা তাই চান।

অশোক ।। এই হত্যাকাণ্ডের আবশ্যকতা কি? উদ্দেশ্য কি? একজন উইলমটকে মারলাম। তার জায়গায় আরেক পুলিশ সুপার আসবে। সে হবে উইলমটের চেয়েও হিংস্র, উন্মত্ত, নিষ্ঠুর। মেরে মেরে ইংরেজ রাজত্ব শেষ হবে?

কুমুদ ।। একটা স্ফুলিঙ্গ থেকেই অগ্নিকাণ্ড হয়। আমাদের পিস্তলের আগুন থেকেই গোটা দেশে অগ্নিকাণ্ড লেগে যাবে।

অশোক ।। অর্থাৎ আমরা এমনই অতিমানব যে আমাদের বীরত্বে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশব্যাপী ভ্যাড়ার সামিল জনতা ক্ষেপে উঠে ঢুঁ মারতে শুরু করবে। মাপ করবেন, অমন ধৃষ্টতা আমার নেই।

দেবব্রত ।। চট্টগ্রামের অভিজ্ঞতা অনেকটা তাই বটে। গণজাগরণ তো হল না। মাঝখান থেকে...

কুমুদ ।। জনতা ভ্যাড়ার সামিল আমি একথা বলিনি, অশোকদাই বলেছে। আমি বলছি জনতা নেতৃত্ব চায়।

অশোক ।। সে নেতৃত্ব দেবার যোগ্যতা রাখো তুমি?

কুমুদ ।। আমি রাখি না। শান্তিদা রাখেন।

বিপিন ।। নিশ্চয়ই।

অশোক ।। মাস্টারদা যেখানে পারেননি, ভগৎ সিং যেখানে ব্যর্থ হয়েছেন? না, আমার মনে হয় শান্তিদাও পারেন না। কোনও লোক একা পারেন না। জনতা নিজেই পারে সে কাজ করতে। নিজের সংগঠন সৃষ্টি করতে। লেনিন বলেছেন...

কুমুদ ।। লেনিন বিদেশে যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন, আমরা সে পদ্ধতি নেব কেন?

অশোক ।। নেব। কারণ, পরাধীনতা সব দেশেই এক — আফ্রিকায়, রাশিয়ায়, ভারতে। বিদেশি বর্জনকে অমন ridiculous limits-এ নিয়ে যেয়ো না কুমুদ, যে পিস্তলটা ব্যবহার করছ সেটাও বিদেশে তৈরি।

অশোক চরিত্রটিকে নিতান্ত এক আগুনখোর একমাত্রিক বিপ্লবী নয়, বরং একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে চান নাটককার। তার উপর দলের কঠোর নির্দেশ আরোপিত হয়, সে যেন কিছুতেই নিজের বাড়িতে না যায়। কারণ তার গোটা পরিবারের উপর পুলিশি স্ক্যানার লাগানো আছে যেহেতু সে উইলমট হত্যার আসামি হিসেবে আত্মগোপন করেছে। অথচ সংবেদনশীল অশোক নিজের স্ত্রী-কন্যা, পিতামাতাকে দেখতে চায়। ঠিক একই ধরনের দুর্বলতা দেখা যায় কুমুদ চরিত্রের ক্ষেত্রেও। যে ব্রিটিশ পুলিশের ইন্সপেক্টর হিতেন দাশগুপ্ত এই বিপ্লবী সমিতিকে ধ্বংস করতে চায়, ঘটনাচক্রে তার কন্যা দেবযানী দাশগুপ্তের প্রেমিক এই কুমুদ। ফলত তারও হৃদয়ের অন্তঃস্থলে এক তীব্র ব্যথা বাসা বেঁধে আছে। অথচ সমষ্টিগত দলীয় নির্দেশের আঁটোসাটো কাঠামোর বিরুদ্ধে কুমুদের একক ব্যক্তিপ্রাণ বিদ্রোহ করে বসলেও সে নিজের বাসনা-কামনাকে দমন করে চলেছে প্রত্যেক মুহূর্তে — ''প্রতি মুহূর্তে নিজের হাতে আমার বুক পুড়িয়ে ছাই করে দিইনি? এক কথায় দেবযানীকে জীবন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিইনি? আজ তোমাদের কাছ থেকে শিখতে হবে না যে পুলিশের মেয়েকে ভালোবাসা অপরাধ''। নাটকের প্রায় প্রত্যেকটি মূল বিপ্লবী চরিত্রই যেহেতু টাইপকাস্ট আদর্শের প্রতিমূর্তি, তাই বেশ্যা রাধাও তার ব্যতিক্রম নয়। এই দলের মধ্যে একমাত্র রাধাই ব্যক্তিগত ভাবে শান্তি রায়কে চেনে। রাধার সঙ্গে শান্তি রায়ের প্রেম

আছে কি না, জ্যোতির্ময়ের এই অহেতুক কৌতূহলী প্রশ্নের জবাবে রাধা বলে — ''একটা আগুন, একটা হাউইয়ের সঙ্গে প্রেম করতে পারে কেউ? আমার বাবা আন্দামানে গিয়েছিলেন। ফেরেননি। দশ বছর বয়স থেকে আমি স্বপ্ন দেখছি শান্তিদার মতো কেউ আসবে। লজ্জা ঘোচাবে। বাঁচার অধিকার দেবে। তারপর সে এল। সূর্য সেন ধরা পড়েননি এখনও, না?'' এর পাশাপাশি অশোক জানায়, 'ব্যক্তিপূজা'কে সে ঘৃণা করে, যেটা তার সংগঠনের একমাত্রিক নিয়ম। এই অবরুদ্ধ জীবনকে তার মনে হয় — ''উই আর অলরেডি ইন প্রিজন''।

পরের দৃশ্যে অশোকের পিতা যোগেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পরিবার। স্ত্রী বঙ্গবাসী এবং পিতা যোগেন্দ্র ছেলে অশোকের এই বিপ্লবী রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়া নিয়ে রীতিমতো গর্বিত। বঙ্গবাসী বলেন — ''এ যুদ্ধ থেকে কারুর মুক্তি নেই। আমি অশোকের মা, আমি বলছি অশোক যদি ধরা পড়ে, ফাঁসিতে ঝোলে তবু আমার ততটা দুঃখ হবে না যা হোত ও ক্লীব হয়ে ঘরে বসে থাকলে। লেখক-টেখক কারুর নিস্তার আছে বলে আমার মনে হয় না। তোমার পেন্‌শন বন্ধ করেছে ওরা — খেতে পাই না পেটভরে — তবু বলব বেশ হয়েছে। অশোক চাটুজ্যের পরিবার আমরা — আমাদের এ সইতেই হবে''। একেবারে টাইপকাস্ট, নির্দ্বন্দ্ব বিপ্লবী চরিত্র। যাদের মনের মধ্যে সংশয় নামক কোনও চারিত্রলক্ষণ থাকে না। এরই মধ্যে ছদ্মবেশি নীলমণি তাদের সাহায্য করতে এলে বঙ্গবাসী নীলমণিকে অপমান করে দৃঢ়তার সঙ্গে তাড়িয়ে দেয়। ইতিমধ্যে রাতের অন্ধকারে স্ত্রী-সন্তান-পিতামাতার টানে অশোক বাড়িতে ঢোকে, দেখা করার জন্য। এক আবেগঘন পরিবেশের জন্ম হয়। আর সেই আবেগাত্মক পরিবেশ আকস্মিকভাবে ভেঙে দিয়ে ঘরে ঢোকে হিতেন দারোগা। বঙ্গবাসী ছেলেকে আলমারির মধ্যে লুকিয়ে রাখেন। কিন্তু শেষরক্ষা হয় না। ইন্সপেক্টর হিতেন দাশগুপ্ত কৌশলে তাকে ধরে ফেলে। অসহায় মা বঙ্গবাসীর পুলিশের উদ্দেশে অভিশাপ বিলাপের মতো শোনায় — ''সন্তানকে তার পিতার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করো? আমি অভিশাপ দিচ্ছি তুমি নির্বংশ হবে। দেশের মানুষের অভিশাপ কুড়িয়ে যেদিন মরবে, কেউ কাঁদবে না, মুখে জল দেবার কেউ থাকবে না। আমি যদি সতী হই, আমার কথা ফলবে''। হিতেন দাশগুপ্ত, বলাই বাহুল্য, নির্লিপ্তভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়, বন্দী অশোককে নিয়ে।

পরের দৃশ্য শুরু হচ্ছে ভুবনডাঙার স্পেশাল পুলিশ ক্যাম্পে, যেখানে বন্দী অশোক ও অন্যান্য বিপ্লবীদের উপর অকথ্য শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালানো হচ্ছে। দুই প্রধান নিপীড়ক পুলিশ অফিসার হিতেন দাশগুপ্ত এবং প্রকাশ মুখুটি। দুজনের কথোপকথন থেকেই বোঝা যাচ্ছে অশোককে অপরিসীম অত্যাচার চালিয়েও মুখ দিয়ে একটাও গোপন তথ্য বের করা যায়নি। অক্ষম আক্রোশে ফেটে পড়ে দুই অফিসার। কোন অদম্য তেজ আর মানসিক শক্তিতে এরা পুলিশের জেরা আর থার্ড ডিগ্রি টর্চারকেও উপেক্ষা করছে সেটাই এই দুই পুলিশ অফিসার বুঝে উঠতে পারে না। ফলে কৌশল কিছুটা বদলায় তারা। আদর-আপ্যায়নের ভান করে, মিষ্টি ব্যবহার করে এইবার অশোককে জেরা শুরু করে তারা। দারোয়ান চৌবে আর একজন কনস্টেবল অশোককে এনে বসায়। প্রচণ্ড অত্যাচারে অশোকের মুখ বিকৃত। জামাকাপড় রক্তাক্ত। পেটের ভেতরে ইন্টারনাল ইনজুরি ও রক্তক্ষরণের কারণে সে কিছুটা খুঁড়িয়ে হাঁটছে। প্রকাশ মুখুটি হাতে চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে ঢোকে এবং সরাসরি অশোককে চা অফার করে, জিজ্ঞাসাবাদ আরম্ভ হয় :

হিতেন ।। অশোকবাবু, আমাদের আর অপরাধী করবেন না, স্যার। আমরাও হুকুমের চাকর। এই পোশাকটা পরেছি পেটের দায়ে, নইলে দেখিয়ে দিতাম দেশকে ভালোবাসতে জানি কি না। আপনার অঙ্গস্পর্শ করার যোগ্যতা আমাদের নেই। আপনাদের বীরত্বের আর

দেশপ্রেমের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা আমাদের অন্তরে আছে। বাইরে সেটা প্রকাশ করি না, করলে চাকরি যাবে...অশোকবাবু আপনি তো ইতিহাসের ছাত্র? ইতিহাসের কোনো পাতায় দেখিয়ে দিতে পারেন, মুষ্টিমেয় কয়েকজন বিপ্লবী একটা সরকারকে উচ্ছেদ করতে পেরেছে?

অশোক ।। (ধীরে বিকৃত স্বরে) পারি।

হিতেন ।। কে করেছে? কোথায় করেছে?

অশোক ।। আমেরিকায় ওয়াশিংটন, ইংলন্ডে ক্রমওয়েল, ফ্রান্সে রোব্‌স্‌পিয়ার, ইটালিতে মাৎসিনি, রাশিয়ায় লেনিন, আয়ার্ল্যান্ডে ডি-ভ্যালেরা।

হিতেন ।। সেটা সম্ভব হয়েছে গণজাগরণের ফলে।

অশোক ।। হ্যাঁ। বিদ্রোহীদের সমর্থন করেছে জনগণ।

হিতেন ।। এদেশের জনগণ তা করবে?

অশোক ।। নিশ্চয়ই।

হিতেন ।। আমার প্রত্যয় হয় না। অশোকবাবু, আপনি অ্যাকচুয়ালি ফাঁসির আসামী তা জানেন? শেষ পর্যন্ত আপনাকে মরতেই হবে। কেন এভাবে শরীর মনকে ক্ষতবিক্ষত করছেন? বলে দিন না। শান্তি রায় কোথায়?

অশোক ।। জানি না।

হিতেন ।। সে কে? কেমন দেখতে?

অশোক ।। জানি না।

হিতেন ।। আপনাদের দলের আড্ডা কোথায়?...চট্টগ্রামের দলের সঙ্গে আপনাদের যোগাযোগ আছে? (জবাব নেই)...কলকাতার চটকল মজদুর ইউনিয়নের সঙ্গে আপনাদের কী সম্পর্ক? (জবাব নেই)...আপনি কি কংগ্রেসের সদস্য? (জবাব নেই)...কংগ্রেসের মধ্যে কম্যুনিস্ট ব্লকের সঙ্গে আপনাদের কী সম্পর্ক? (জবাব নেই)...উইলমট সাহেবকে প্রকাশ্যে গুলি করে মেরেছেন, অশোকবাবু, পালাবার কোনও পথ নেই, একটি ছাড়া। রাজসাক্ষী হোন — একটা বলে দিন, মৃত্যুদণ্ড রদ হবে। আয়ু যতই কমে আসছে ততই যেন বেশি বোকা হয়ে যাচ্ছেন।

পুরোদস্তুর একজন বিপ্লবীকে শারীরিক ও মানসিকভাবে হত্যার চেষ্টা এই জেরার ছত্রে ছত্রে। অশোক ব্যঙ্গের হাসি হাসতে থাকে। বিষম ক্রোধে ফেটে পড়ে হিতেন দাশগুপ্ত। উন্মাদের মতো অশোককে মারতে থাকে সে। হান্টার চালাতে থাকে পাগলের মতো, বলে — ''স্পিক, ইউ সোয়াইন। জবাব দেবে কি না? শান্তি রায় কে? কোথায় থাকে? ইউ বাস্টার্ড বলশেভিক। বিপ্লব করবে। স্ট্যালিন হয়েছে। ডি-ভ্যালেরা হয়েছে। সূর্য সেন হবার সাধ গিয়েছে। বলবে কি না? প্রকাশবাবু! বিট দ্য লাইফ আউট অফ হিম''। হাতে লৌহ-দস্তানা পরে অশোককে মারতে থাকে প্রকাশ মুখুটি। এরপরেও অশোক কথা বলছে না দেখে হিতেন দাশগুপ্ত তার শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করে। বলে — ''অশোকবাবু, আপনার স্ত্রী, মেয়ে, মা, বাবা — সবার চেয়ে কি শান্তি রায় আপন হল? আপনার স্ত্রী শচীদেবীকে অ্যারেস্ট করতে পুলিশ গেছে। ওই শিশুকন্যাটিকেও ছাড়বে না সরকার, শান্তি রায় কে বলে দিন — আপনার স্ত্রীর গায়ে হাত দেওয়া হবে না। এই পাশবিক পরিবেশে এই বর্বরদের হাতে স্ত্রীকে ছেড়ে দেবেন?'' এরপর খোদ ব্রিটিশ পুলিশকর্তা আসে এবং এই বাঙালি অফিসারদ্বয়কে হুকুম দেয় যেকোনও নৃশংস উপায়ে হোক, অশোকের মুখ থেকে কথা বের করতেই হবে। এখানেই উৎপল দত্তের নাটকের বিশেষত্ব, এই চরম সঙ্কটের মুহূর্তেও আবেগ

এবং উত্তেজনাকে একেবারে চরম শীর্ষ স্তরে পৌঁছে দেবার কৌশল প্রয়োগ। অশোকের অতিসাধারণ স্ত্রী, যে স্বামীকেই কেবল ভালবাসে, তার বিপ্লবী রাজনীতি সেরকম বোঝে না, সেও মা বঙ্গবাসী, বাবা যোগেনের মতো চূড়ান্ত বিদ্রোহী এক চরিত্র হয়ে দাঁড়ায়, উৎপলের মতাদর্শগত হাতিয়ার হয়ে ওঠে এই সাধারণ নারী, শচী। সে পুলিশি নির্যাতনের সামনে নিজের ভীরুতা ঝেড়ে ফেলে রুখে দাঁড়ায় :

শচী ।। বলবে না। অশোক চাটুজ্যে একটি কথাও বলবে না।
হিতেন ।। আপনার ইজ্জত যাওয়ার ভয় নেই?
শচী ।। স্বামীকে মেরে ফেলেছেন আপনারা, আর ইজ্জতের ভয়? এ আমি জানতাম না। এভাবে যে একটা উদারচেতা পুরুষকে আপনারা নির্যাতন করেছেন এ জানতাম না।
হিতেন ।। আপনার মেয়েকে ধরে এনে আপনার সামনে যদি পঙ্গু করে দিই?
শচী ।। সারাজীবন সেটা তার গর্বের বিষয় হয়ে থাকবে। সে যে অশোক চাটুজ্যের মেয়ে...

হিতেন দাশগুপ্ত হতাশ হয়ে বলে ওঠে — ''সবাই সমান। হিস্টিরিয়ায় ভুগছে। দেশপ্রেম জিনিসটাই একটা স্নায়বিক রোগ''। কিন্তু এরপর পুলিশ আরও ভয়ঙ্কর এক কৌশল নেয়। অশোককে ট্রেইটর বা বিশ্বাসঘাতক হিসেবে রটিয়ে দেবার পরিকল্পিত চক্রান্ত। হিতেন দাশগুপ্ত বলে — ''এবার আমার শেষ কথাটা শুনুন। অশোক চাটুজ্যে একটা যে দুর্দমনীয় বিপ্লবী এই কিংবদন্তিটা শেষ করে দিতে আমাদের বেশি সময় লাগবে না। প্রথমে শেষ করেছি আপনার দেহ। এবার শেষ করব আপনার সুনাম। ধরুন যদি রটিয়ে দিই আপনি সব বলতে শুরু করেছেন...বিশ্বাস করাতে পারি। খুব সহজ। এই তো দেখুন না স্টিমারঘাটায় আপনাদের প্রেস আছে, সেটার খোঁজ পেয়েছি আমাদের সিআইডির কাছ থেকে। পরশু নাগাদ রেইড করব। এখন হানা দেয়ার সময়ে যদি আপনাকে ভালো কাপড়চোপড় পরিয়ে বসিয়ে রাখি গাড়িতে, জনসন সাহেবের পাশে? পুলিশের বড়কর্তার পাশে আপনাকে দেখে কমরেডরা কি ভাববেন? এ রকম মাসখানেক এদিক ওদিক ঘোরালেই হবে। যেখানেই পুলিশ গ্রেপ্তার করছে, খানাতল্লাসি করছে, সেখানেই অশোক চাটুজ্যেকে দেখা যায় বড় কর্তার গাড়িতে। গায়ে দামী স্যুট। মুখে সিগারেট...তখন কি হবে? দল থেকে আপনাকে বিতাড়িত করবে শুধু তাই নয়, শান্তি রায় আপনাকে মৃত্যুদণ্ড দেবে। আপনার স্ত্রী আজ মাথা উঁচু রেখে চলে গেলেন তিনি অশোক চাটুজ্যের স্ত্রী বলে। সেই শচী দেবীই আপনার নামে মাথা নীচু করবেন, সন্তানকে শেখাবেন আপনার নাম ভুলে যেতে। যোগেনবাবু এবং আপনার মা ছেলের পরিচয় দিতে লজ্জাবোধ করবেন। অশোকবাবু বিশ্বাসঘাতক হোন বা না-হোন, বিশ্বাসঘাতক আখ্যা আপনাকে পাওয়াবই''। এই তীব্র ষড়যন্ত্রের সামনে পড়ে সাময়িক ভাবে বিচলিত অশোকের মুখ থেকে রাধারাণীর কথা বেরিয়ে আসে। পুলিশ বেশ্যা রাধারাণীর ডেনের সন্ধানে এবার খোঁজখবর নিতে শুরু করে।

পরের দৃশ্যে দেখা যায়, নদীতীরে রাধারাণীর ঘরের ডেনে বসে বিপ্লবীরা সুড়ঙ্গ খোঁড়ার পরিকল্পনা করছে। কাজ শুরুও হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে দু-একজন বিপ্লবীর মানসিক দুর্বলতা প্রকাশ হয়ে পড়ছে। কুমুদ গত পরশু হিতেন দাশগুপ্তের মেয়ে দেবযানীর সঙ্গে লুকিয়ে দেখা করে এসেছে। এটা বিপ্লবীদের কাছে তার চারিত্রিক দুর্বলতারই প্রকাশ। ইতিমধ্যে অশোকের বিশ্বাসঘাতকতার তত্ত্ব এই ডেনের বিপ্লবীদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। আর অশোকের কথার সূত্র ধরে হিতেন দাশগুপ্ত ঢুকে পড়ে এই ডেনে। বিপ্লবীরা সুড়ঙ্গে লুকোয়। রাধা, যে বেশ্যা, অথচ মনে-প্রাণে বিপ্লবী, গোটা স্বদেশি যোদ্ধাদের দলটাকে লুকিয়ে প্রথমে রিভলবার তুলে ধরে হিতেনের দিকে। তারপর হিতেনকে মদ খাইয়ে, মিষ্টি কথায়

বিপ্লবীদের কার্যকলাপের কথা বলে তার আস্থা অর্জন করে, অবশেষে মদের ভিতর ওষুধ মিশিয়ে তাকে অজ্ঞান করে দেয়। এই অংশে হিতেনের পরিণতি সম্পর্কে স্পষ্ট কিছু বলা না হলেও পরবর্তী একটি অধ্যায়ের সাপেক্ষে জানা যায়, হিতেনকে বিপ্লবীরা প্রথমে গুম করে, তারপর হত্যা করে। ওদিকে অশোকের বিশ্বাসঘাতক স্পাই হয়ে যাবার খবর চাউর হতেই মানসিকভাবে চূড়ান্ত ভেঙে পড়েন তার বাবা যোগেন, মা বঙ্গবাসী। এমনকি অশোক এক রাতে লুকিয়ে বাড়ি এলেও তার মা-বাবা তাকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন। অশোক নিজের নির্দোষ অবস্থানের কথা জানিয়েও রেহাই পায় না, কারণ, সাব-ইন্সপেক্টর প্রকাশবাবু ঢোকে সেখানে এবং বলে, তাদের নির্দেশেই শান্তি রায়ের খোঁজ বের করতে অশোক বাড়ি এসেছে। অশোকের কথায় যেটুকু দ্বিধা তৈরি হয়েছিল তার মা-বাবার মনে, সেটুকুও এবার ধুয়ে মুছে যায়। যোগেন পুলিশকে বলে ওঠেন — ''গোপার বাবা মরে গেছে...দেখুন আপনাদের আমি ঘৃণা করি। বয়স থাকলে সত্য বলছি আমার সব বই পুড়িয়ে ফেলে ঝাঁপিয়ে পড়তাম এই বিপ্লবে একবার — একবার দেখে নিতাম অশোক চাটুজ্যের কতো বড়ো বুকের পাটা...এ এক ভীষণ দানব। ঘর বাড়ি সুখ স্বাচ্ছন্দ্য সব কেড়ে নিয়েছে। এবার কেড়ে নিল আমাদের সন্তান। আমাদের বুকের রক্তে মানুষ করা সন্তান। আমাদের স্বপ্নের আদর্শ দিয়ে গড়ে তোলা সন্তান। আমাদের বেঁচে থেকে আর লাভ নেই। আমাদের সন্তান চলে গেছে"।

পরের দৃশ্যে জনসনকে বোমা মেরে হত্যা করার পরিকল্পনা নিয়ে ইসলামপুর খালের ধারের পোলের নিচে সমবেত হয়েছে বিপ্লবীরা। কিন্তু এই অংশে আর একজন বিপ্লবী, জ্যোতির্ময়ের মনের দ্বিধা ও দোদুল্যমানতা দেখা যায়। এই অংশের কথোপকথনে ব্যাপারটা স্পষ্ট হয় :

জ্যোতির্ময় ।। মনের মাইন্ডটারে প্রিপেয়ার করা লাগে। জীবহত্যার পূর্বে কালীপূজা শিবপূজা কইরা মনটারে স্ট্রং করা লাগে। কারে মাইরতে হইবে।...

দেবব্রত ।। তার মানে? সপ্তকাণ্ড রামায়ণ পড়ে এখন...

জ্যোতির্ময় ।। মাস্টারমশাই, মৃত্যু অবধারিত। তখন হেই ডেথ-এর মুখোমুখি আইস্যা ভাবি কেমনে বাঁচি? অশোক কইত লাইফ ইজ বিউটিফুল! অখন বুঝি। বুঝি যে সত্যই বাঁচবার চাই। জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ জিনিস জীবন।

দেবব্রত ।। কাওয়ার্ড। শেষ মুহূর্তে পিছিয়ে যাচ্ছ। বিশ্বাসঘাতক!

জ্যোতির্ময় ।। কথা। ওয়ার্ডস। শুইনতে মন্দ লাগে না। যে কাজ দিছে শান্তিদা করুম। কিন্তু মনরে আর ডিসিভ করুম না। হ, ভয় পাইতেছি— ভীষণ ভয়ে অন্তরাত্মা কাঁপতে আছে। এবং আই অ্যাম নট এশেমড! জীবন ভালোবাসি হেই কথা কইতে আর লজ্জা পাই না...

বিপিন ।। মাস্টারমশাই, ভয় আমি পাই না। কিন্তু অশোক এক প্রশ্ন তুলি দেছে তার জবাব পাই না।

দেবব্রত ।। কি প্রশ্ন?

বিপিন ।। এমনি ধারা খুন করতি করতি কি মানুষরে জাগায়ে তোলা যাবে? নাকি অন্ধকারে পথ হাতড়ায়ে মরতিছি সকলে মিলি...

জ্যোতির্ময় ।। ঠিক। মারার মুহূর্তটাই আনপ্লেজান্ট।

এই 'অপারেশন জনসনে'র ক্ষেত্রেও বিপ্লবীরা চরম ভুল করে ফেলে। তারা জনসনের গাড়ি ভেবে বোমা ছুঁড়ে হত্যা করে ফাদার ফ্ল্যানাগানকে। এই অযাচিত ও অনভিপ্রেত হত্যায় ও অনুশোচনায় দেবব্রত জ্বরের

ঘোরে বেহুঁশ হয়ে পড়ে। বিপিনও অনুশোচনায় দগ্ধ হয়। এই হতোদ্যম বিপ্লবীদের ডেরায় এবার আবির্ভাব হয় ছদ্মবেশী স্পাই নীলমণি ওরফে নেতা শান্তি রায়ের। এখানে বসেই পরবর্তী অপারেশন, ব্রিটিশ কোম্পানির তেলের গুদামে বিস্ফোরণ ঘটানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়। পুলিশ আক্রমণ করে এই ডেরা। এইবার দেবব্রতর জ্বরের ঘোরে ভুল বকা শুনে পুলিশ এক বিরাট চক্রান্তের হদিশ পায়। রাধাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায় পুলিশ। শান্তিদা এই অংশের শেষে বলেন — ''ভাবছি মাই কমরেডস আর ফলিং বাই দ্য ওয়েসাইড ওয়ান বাই ওয়ান। হাতকড়া ছিল বলে প্রমাণটাও করতে পারল না। এমন-এমন প্রচণ্ড আঘাত হানবে শান্তি রায় যে, দেশমাতৃকার শৃঙ্খল একবার ঝনঝন করে উঠবে। আরও কি জানিস? দেশমাতৃকা আমার কাছে একটা নিছক কল্পনা নয়। তার মুখ ঠিক — ঠিক ওই রাধার মতন সে দেখতে''। একমুহূর্তে শৃঙ্খলিত দেশমাতার মুখ পুরুষতন্ত্রের পীড়নে পিষ্ট বেশ্যা রাধার সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় বিপ্লবী রোম্যান্টিকতার অনির্দেশ্য নিরিখে। নাটকের শেষ দৃশ্যে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া কোম্পানির অয়েল ট্যাঙ্কারে বিস্ফোরণ ঘটাতে হাজির হয় পুরো বিপ্লবী গ্রুপ। কিন্তু ফের বিশ্বাসঘাতকতা ধ্বংসের পথে নিয়ে যায় তাদের। এইবার বিশ্বাসঘাতকতা করে কুমুদ। সে পুলিশকে নিয়ে আসে অকুস্থলে এবং গোটা পরিকল্পনা ফাঁস করে দেয়। চারিপাশ যখন পুলিশ ঘিরে ফেলেছে, অশোককে নিয়ে ঢুকেছে পুলিশবাহিনী, শান্তিদা ট্রেইটরের মৃত্যদণ্ড দেবার উদ্দেশ্যে অশোককে গুলি করে মারেন। কিন্তু শেষ মুহূর্তে অশোক জানিয়ে দেয়, সে আদৌ কোনও বিশ্বাসঘাতকতা করেনি। পুলিশের গুলিতে লুটিয়ে পড়ে জ্যোতির্ময়। অবশেষে ব্রিটিশ পুলিশের গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যায় শান্তিদার দেহ। তাঁর মৃতদেহ ঘিরে একে একে জড়ো হয় জনগণ। তারা বলাবলি করে :

১ ।। শহীদ হইছেন শান্তি রায়।
ছিদাম ।। কে শান্তি রায়? এ কক্ষনো না। আমি চিনি তারে। অন্য কারে মাইরা আইনা ফালাইয়া গেছে — এইখানে।
২ ।। শান্তি রায় হইতেই পারে না।
৩ ।। শান্তি রায় অমর। শান্তি রায়ের মৃত্যু নাই।

উৎপল দত্তের রাজনৈতিক বীক্ষা : পরিপ্রশ্ন

আজীবন নিজের অর্জিত র‍্যাডিকাল মার্কসবাদী বিপ্লবী দর্শন এবং বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ভাবাদর্শকেই নিজের নাটকের প্রাণপ্রতিষ্ঠার কাজে ব্যবহার করে গেছেন উৎপল দত্ত। সেই চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে ১৯৯৩ সালে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত এই দুঃসাহসী প্রতিভাবান নাট্যব্যক্তিত্ব তাঁর প্রসেনিয়াম থিয়েটার, যাত্রাপালা, ও পথনাটকে নিজের রাজনৈতিক বিশ্বাসে অনড় ছিলেন। স্বল্প সময় গণনাট্য সঙ্ঘের সঙ্গে থাকার অভিজ্ঞতার পর্বটি পেরিয়ে তিনি মূলত অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি, পরে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থেকেছেন। মাঝে কয়েকবছরের জন্য অবশ্য উগ্র অতিবামপন্থী নকশালদের সঙ্গেও যুক্ত হয়ে গিয়েছিলেন এবং লিখেছিলেন নাটক; 'তীর', যা বাংলা রঙ্গমঞ্চে প্রথম নকশালপন্থী নাটক। দ্রুত এই হঠকারী ভ্রান্ত কানাগলির রাজনৈতিক পথ প্রত্যাহার করে ফের মূলস্রোতে ফিরে আসেন তিনি। এরপর আমৃত্যু মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির ছত্রচ্ছায়ায় থেকেই নিজের নাট্যচর্চা অব্যাহত রেখেছিলেন। আলোচ্য 'ফেরারী ফৌজ' নাটকের ক্ষেত্রেও বিষয় ১৯৩০-এর দশকের একেবারে গোড়ার দিকের স্বদেশি সশস্ত্র আন্দোলন হলেও তার মধ্যেও স্তালিন, বলশেভিকবাদ ইত্যাদির উল্লেখ থেকে

বোঝা যায় এই অগ্নিযুগের আর্মড রেভোলিউশনারি প্রচেষ্টাকে তিনি মার্কসবাদী বিপ্লব-প্রচেষ্টা হিসেবে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট করার চেষ্টা করছেন। পূর্বোক্ত শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেওয়া সাক্ষাৎকারেই তিনি বলেছেন, যাবতীয় পূর্ববর্তী সশস্ত্র গণ-আন্দোলনকে কমিউনিস্টরা 'ক্লেইম' করার অধিকার রাখে। তিতুমিরের নারকেলবেড়ের যুদ্ধ থেকে নৌ-বিদ্রোহ অব্দি সমস্ত লড়াইই আসলে কমিউনিস্ট দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার একটা প্রয়াস। আমরা যখন 'ফেরারী ফৌজ' নাটকটি পড়ি, তখনও সেটি ওই বিপ্লবী আন্তর্জাতিকতাবাদী সংগ্রামের উত্তরাধিকার হিসেবে দেখার চেষ্টা করি আমরা। কারণ উৎপল নিজে সেই বিশেষ দর্শনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

উৎপল দত্ত মারা যান ১৯৯৩ সালে। জীবিতাবস্থায় ১৯৭৭ থেকে একাদিক্রমে চারটি বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠা দেখে গিয়েছেন তিনি। তাঁর জীবদ্দশায় মার্কসবাদী পার্টি-নিয়ন্ত্রিত দল এবং সরকারকে বাংলার সমাজের প্রত্যেকটি রন্ধ্রে রন্ধ্রে অণু-ক্ষমতার বিস্তার এবং এক সুবিশাল পার্টি-সোসাইটি গড়ে তুলতে দেখেছেন তিনি। দেখেছেন মরিচঝাঁপি (১৯৭৯), কসবা বিজন সেতু আনন্দমার্গী হত্যা (১৯৮২), করন্দা (১৯৯৩)-সহ একাধিক নৃশংস গণহত্যায় মানুষের প্রাণ নিতে। এমনকী সত্তরের মাঝামাঝি পি সুন্দরাইয়া যখন আরএসএস-এর সঙ্গে যৌথভাবে জরুরি অবস্থা-বিরোধী অবস্থান নিচ্ছে সিপিআইএম — এই অভিযোগে পার্টি-সম্পাদকের পদ থেকে ইস্তফা দেন, বৃহত্তর গণ-আন্দোলনের স্বার্থে সিপিআইএম-এর সেই চরম দ্বিচারিতার পক্ষেই তিনি কথা বলেছিলেন (দ্রঃ শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেওয়া সাক্ষাৎকার)। যে উৎপল তাঁর সাময়িক হঠকারী নকশালপন্থী পর্বে শ্লোগান দিয়েছিলেন — ''ক্রুশ্চেভের কোলে প্রমোদ-জ্যোতি দোলে'' (অজিত পাণ্ডের স্মৃতিচারণ, এপিক থিয়েটার, গণসঙ্গীত সংখ্যা), সেই তিনিই ১৯৭৭-এ সিপিএম ক্ষমতায় আসার পরে নিজের রাজনৈতিকতার বিপ্লবী ঝাঁঝ রীতিমতো প্রশমিত করে ফেলেছিলেন। আজ, সোভিয়েতের পতন, বিশ্বায়িত মুক্ত পুঁজি-নিয়ন্ত্রিত উন্মুক্ত উত্তর-আধুনিক পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে আমরা যখন টের পাচ্ছি, মিশেল ফুকো কেন বলেছিলেন — ''মার্কসবাদ হল উনিশ শতকের জলের মাছ, বিশ শতকের শুকনো ডাঙায় আনলেই সে খাবি খায়''! তখন উৎপল দত্তের ওই নির্দ্বন্দ্ব, গোদা, চরম স্থূল রাজনৈতিক অবস্থান রীতিমতো প্রশ্নচিহ্নের সামনে পড়বেই। তাঁর নাটকের অভ্যন্তরে ব্যবহৃত অন্ধ মার্কসবাদী ভাবনাগুলোকে আজ নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে হবেই। একইসঙ্গে এটাও মনে রাখতে হবে, উৎপল এই নতুন বিশ্ববীক্ষা ও দার্শনিক প্যারাডাইমের সঙ্গে আদৌ পরিচিত ছিলেন না। তিনি ১৯৯২ সালে তাঁর 'প্রতিবিপ্লব' থিসিসে নিজের মতো করে ওই কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিপর্যয়কে ধরার চেষ্টা করলেও পরবর্তী কালের প্রেক্ষিতে তাঁর দেওয়া সেই বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা একেবারেই যে অচল হয়ে যাবে, তা তিনি সেদিন বুঝে উঠতে পারেননি। তাই এই যুগন্ধর প্রতিভাবানকে আমরা আলোচনা করব তাঁর নিজস্ব কালিক ও স্থানিক সীমাবদ্ধতা সহ। আমরা বোঝার চেষ্টা করব, যে উত্তরাধিকার তিনি বহন করে এসেছেন প্রায় অর্ধশতকের নাট্যপরিক্রমায়, তাকে বুঝতে হবে সেই সময়ের সীমাবদ্ধতা নিয়েই। কিন্তু তারপরেও কিছু প্রশ্নচিহ্ন থেকে যায়। রয়ে যায় কিছু সংশয়, ব্যাসকূট।

উৎপল দত্তের মৃত্যুর প্রায় আড়াই দশক পরে বাংলা উত্তর-আধুনিক নাট্যপ্রজন্মের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিভা শ্রীব্রাত্য বসু উৎপলকে নিয়ে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন — *একিলিসের গোড়ালি : উৎপল দত্ত ও রাজনীতি*। এই প্রবন্ধটিকে আমরা বলতে পারি উৎপল-সম্পর্কিত দীর্ঘলালিত মিথের সার্থক বিনির্মাণ। ব্রাত্য দেখাচ্ছেন, উত্তর-স্বাধীনতা পর্বে, বিশেষত পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি থেকেই বাংলার সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বদের দুটিমাত্র আশ্রয়স্থল ছিল — একটি বৃহৎ সংবাদপত্র, অন্যটি কমিউনিস্ট পার্টি। নাটক থেকে সাহিত্য — এই সমস্ত মাধ্যমের শ্রেষ্ঠ শিল্পীরাই এই দুই মাধ্যমের আশ্রয়ের নিরাপত্তা চেয়েছেন। উৎপল স্বভাবসিদ্ধ ভাবেই কমিউনিস্ট পার্টির আশ্রয় নিয়েছিলেন নিজের নিরাপত্তা, খ্যাতি, প্রতিষ্ঠাকে নিশ্চিত

করার জন্য। এ হল এক দুরন্ত প্রতিভার নিজেকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার, প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য গৃহীত ট্যাকটিক্স। নব্বইয়ের শেষদিক থেকে যে অধিকাংশ সাংস্কৃতিক প্রতিভা একদিকে দক্ষিণপন্থী সংবাদমাধ্যম এবং অন্যদিকে ক্ষমতাসীন সরকারি কমিউনিস্ট পার্টি; এই দুটোরই সাপোর্ট নিতে শুরু করবেন, দু'তরফেরই সুবিধেগুলো নেবার চেষ্টা করবেন, সেই যাবতীয় পুরোনো লজিক ভেঙে ফেলার বাতাবরণ তাঁকে দেখে যেতে হয়নি। তাঁকে দেখে যেতে হয়নি, তাঁর সাধের মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি যাবতীয় মতাদর্শ শিকেয় তুলে রেখে টাটা-সালিমের মতো অতিবৃহৎ কর্পোরেট পুঁজির তোষামোদ করতে গিয়ে বাংলার জনগণের থেকে বিচ্ছিন্ন হল এবং শেষপর্যন্ত ক্ষমতা থেকে উৎখাত হতে বাধ্য হল। ব্রাত্য বসু তাঁর নির্ণায়ক নিবন্ধে লিখছেন — ''কমিউনিস্ট পার্টি আসলে তাঁর কাছে ছিল থিয়েটার করারই একটি স্ট্র্যাটেজি, একটি অবলম্বন, আজীবন 'টিনের তলোয়ার' উদ্যত ও অভ্রান্ত রাখার এক নয়া ঔপনিবেশিক কৌশল। তাই 'টিনের তলোয়ার' নাটকে অক্লেশে বেণীমাধব-রূপী উৎপল বলতে পারেন, 'নীতিবোধ নিয়ে চললে আর থিয়েটার করতে হত না এ দেশে। বীরকৃষ্ণ দাঁয়েদের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে থিয়েটার চালাতে হয়। তাই চালিয়ে আসছি বহু বৎসর'। ব্রাত্য বিস্তারিত লিখেছেন ব্রিটিশ তাত্ত্বিক পল জনসনের কথা। যিনি তাঁর 'ইন্টেলেকচুয়ালস' বইতে দেখিয়েছেন সেই প্রাচীন যুগ থেকে আধুনিক সময় অব্দি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ স্রষ্টারা কীভাবে এক একজন তুখোড় 'ম্যানিপুলেটর' হিসেবে শিল্পক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করেছেন নিজেদের। এ প্রসঙ্গে ব্রাত্য উৎপল দত্ত এবং সর্বকালের সেরা জার্মান নাটককার বের্টল্ট ব্রেখটের একটি প্রতিতুলনা খুঁজেছেন। দেখিয়েছেন, এই দুই বৃহৎ প্রতিভাই কমিউনিস্ট পার্টির সান্নিধ্যকে নিজেদের সৃষ্টিশীল সত্তা এগিয়ে নিয়ে যাবার কাজে ব্যবহার করেছেন। এতে অবশ্যই তাঁদের প্রতিভা কোনও অংশে ক্ষুণ্ণ হয় না, কিন্তু 'আধুনিকতা' নামক চিন্তনপ্রক্রিয়া যেভাবে পরস্পরবিরোধী অবস্থানের দ্বিবাচনিকতাকে এড়িয়ে গিয়ে একটাই বাঁধাসড়কের লিনিয়ার ইতিহাস রচনা করতে চায়, উৎপলের মাপের শিল্পীকে সেই খণ্ডিত দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা ভুল। আজ, এই ২০২৩ সালে বেঁচে থাকলে উৎপল দত্ত ঠিক কী রাজনৈতিক অবস্থান নিতেন আমরা জানি না। কিন্তু তাঁর অনড় 'প্রোপাগাণ্ডিস্ট'/ 'অ্যাজিটেটর' অবস্থান যে আজ এই পরিবর্তিত সময়ে দাঁড়িয়ে খানিকটা নড়বড়ে হয়ে যেত, তা অনস্বীকার্য। এই বদলে-যাওয়া সময়ের দাবি মেনেই আজ আমাদের তরফে উৎপল দত্ত-রচিত 'ফেরারী ফৌজ' নাটকটির বিশ্লেষণ করা দরকার বলেই মনে হয়।

অর্ণব সাহা : গবেষক, প্রাবন্ধিক, গল্পকার ও ঔপন্যাসিক। শেঠ আনন্দরাম জয়পুরিয়া কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক।